থিয়েটার-ই, তবে পর্দায়

সলিল সরকার

"আমরা তো ছবি করি না, কেবলই দেখি লোককে কী করে চমক লাগানো যায়। এ যেন দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে চমক দেওয়ার মতো। এরই নাম আমরা বলি নাটক।" —রেনোয়া*

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি আর যাই হোক নাটক বা নাট্যের সংজ্ঞা নয়। কিন্তু চলচ্ছবির ক্ষেত্রে অর্থাৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের কালে এই 'চমক' যে নাটকেরই অনুকরণ বা অনুসরণ তা সবাই মানবেন। আর আমাদের আলোচনাও চলচ্চিত্রের এই নাট্যের অনুকরণ ও অনুসরণ বিষয়ে।

বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক ও চলচ্চিত্র স্রষ্টা জাঁ ককতো একদা গ্রীক রীতির অনুসরণ করে চলচ্চিত্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন শিল্পের গ্রহমণ্ডলীর দশম গ্রহ বা টেনথ্ মিউজ নামে। ককতোর এই অভিধা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনই বাস্তব। কারণ, বয়সের নিরিখে চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পের তুলনায় নেহাতই শিশু হলেও জনপ্রিয়তা, গতিশীলতা ও নান্দনিকতার বিচারে সে আজ শিশু বা কিশোর নয়, একেবারে যুবক। জন্মের প্রায় পরে-পরেই বিশ্বের আধুনিকতম শিল্পের দাবিদার হয়ে উঠেছে সে। বস্তুত নান্দনিক শিল্পের জগতে চলচ্চিত্র আজ একমাত্র শিল্প যা আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েও মূলত দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য এই তিনের তাবৎ মাধ্যমকে আত্মস্থ করে এক স্বতন্ত্র, সার্বিক শিল্প। এখন প্রশ্ন হল চলচ্চিত্রের পূর্বসূরী আমরা কাকে বলব? বলা বাহুল্য তার উত্তর ততটা সহজ নয়, তবুও সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায়, দুটি বিষয়ের উপরই গড়ে উঠেছিল সে। প্রথমত, প্রযুক্তির দিক থেকে স্থির চিত্র যেদিন চলমান চিত্রে রূপান্তরিত হল আর দ্বিতীয়ত বা নান্দনিক দৃষ্টিতে এই চলমান চিত্র যখন আশ্রয় নিল পূর্বজ নাট্যকলাতে। বস্তুত, চলচ্চিত্র সৃষ্টির পূর্বে নাট্যশিল্পই ছিল দৃশ্য কাব্য সমন্বিত এক শিল্প যা সর্বগ্রাসী ও সার্বিক। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত নাট্যের এই পল্লবগ্রাহিতা ও আত্মস্থতাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে—

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন তদ্ যোগ ন তদ্ কর্ম নাট্যোহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ, এমন কোনও জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, বিদ্যা নেই, কলা নেই, যোগ ও কর্ম নেই (অবশ্যই মানুষের অধিগত) যা নাট্যে দৃশ্যমান হয় না বা গৃহীত হয় না। নাট্যকলার

---

* 'রেনোয়ার চোখে বাংলাদেশ' : চিদানন্দ দাশগুপ্ত

বিষয়ে একথা আজও সত্য।

চলচ্চিত্র নাট্যের এই সব ধর্মকে আত্মস্থ করে বাড়তি মাত্রা হিসাবে পেয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির যাবতীয় উপকরণ। অবশ্য এই কারণে সে যে একেবারে স্বতন্ত্র শিল্প তা বলতে তার সময় লেগেছে বেশ কিছুদিন। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মতোই জন্মের শুরুতে তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল ঠিক তার পূর্ববর্তী সার্বিক শিল্প নাট্যের প্রতি। তখন থিয়েটার বা নাট্যকলাই ছিল তার শিল্প উপকরণ বা শৈল্পিক উপাদান সংগ্রহের আকর। এমনকি এই আকরের প্রভাব শুরুতে এতই তীব্র ছিল যে তার থেকে মুক্ত হতে—মুক্ত যে হওয়া যায়, চলচ্চিত্র যে নিছকই চিত্রের চলমানতা নয়, কাহিনীর চিত্ররূপ নয় অর্থাৎ সে যে এক স্বতন্ত্র শিল্প, তার যে থাকতে পারে নিজস্ব ভাষা তা বুঝতে ও অর্জন করতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র শিল্পের সম্পর্ক যেমন একমুখি তেমনই নির্ভরতা ও অনুকরণ প্রিয়তার। একথা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের নির্মাণকালে প্রযোজ্য। আর ভারতীয় এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই সেদিনও ছিল তা রূঢ় বাস্তব।

ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবাংলায় চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশ

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্যি, ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের শুরু ইয়োরোপের প্রায় সমসাময়িক কালেই, আর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র গুণ, মান ও পরিমাণে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলত। আজ চেহারাটা অবশ্য একেবারে ভিন্ন এবং আমাদের আলোচনাও সে প্রসঙ্গে নয়। যাই হোক, এদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রথম কৃতিত্ব ফরাসি লুমিয়ের ভাইদেরই প্রাপ্য। লুমিয়ের ভাইয়েরা তাঁদের 'সিনেমাটোগ্রাফ' নিয়ে এদেশে আসেন ১৮৯৬ সালেই।* বোম্বাইয়ের ওয়েস্টন হোটেলে ১৮৯৬-র জুন-জুলাইয়ে তাঁরা যে টুকরো-টুকরো চলমান কিছু দৃশ্য প্রদর্শন করেছিলেন সেগুলির টাইটেল ছিল—Arrival of a train, Sea bathers, Parade of the guards, Stormy sea, ইত্যাদি। এর দু বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে পশ্চিমবাংলার কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় মিস্টার স্টিফেন-এর 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি'র সাহায্যে। কলকাতায় সে সময় চলচ্চিত্র দেখানোর জন্য কিন্তু কোনও হোটেল বা ময়দান বেছে নেওয়া হল না, নেওয়া হল শহরের উৎকৃষ্ট স্থান যে স্থানে সপ্তাহের তিনটি দিন কয়েকশো লোক উপস্থিত হতোই। কলকাতায় সে সময় যে দুটি স্থান নির্বাচিত হয়েছিল তার দুটিই তখনকার জনপ্রিয় নাটমঞ্চ—একটি ধর্মতলায় সাহেবপাড়ার 'থিয়েটার রয়েল' (বর্তমানে যে স্থানে গ্র্যান্ড হোটেল) আর দ্বিতীয়টি বাঙালিপাড়ার 'স্টার' রঙ্গমঞ্চ (পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'এমারেল্ড', 'ক্লাসিক', 'আর্ট' ইত্যাদি। ৬৮, বিডন স্ট্রিটের এই নাটমঞ্চ আজ নিশ্চিহ্ন। ১৯৩১ সালে সেন্ট্রাল

* ফরাসি লুমিয়ের ভাইয়েরা (LUMIERE BROTHERS) ১৮৯৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে দুটি ছোট খণ্ড দৃশ্য প্রথম চৌষট্টিজন দর্শকের সামনে পর্দায় প্রতিফলিত করেছিলেন।

এভিনিউ তৈরির জন্য নাটমঞ্চটি ভেঙে ফেলা হয়।) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে স্টিফেন দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনার ফাঁকে-ফাঁকে চলচ্চিত্র দেখাতেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলেও এই মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হল এবং সেই দৃশ্য যা একটু আগেই মঞ্চে অভিনেতা-নেত্রীরা মঞ্চস্থ করলেন। এইভাবেই আধুনিক শিল্পটি নাটমঞ্চের স্বারস্থ হওয়ার পর দীর্ঘকাল মঞ্চের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকল। কিন্তু কীভাবে? সে কথাতেই আসছি।

বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের হেঁসেল সংবাদ

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের অনুপ্রবেশের পর ক্রমে ক্রমে তাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বিদেশি কোম্পানিগুলিই এগিয়ে আসে, কিছু পরে ভারতীয়রা। বিশেষত কলকাতায় চলচ্চিত্রকে সাধারণের কাছে পরিচিত ও গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে স্টিফেন যেমন চেষ্টা করলেন পরে ফ্রেমিং নামে এক ব্যবসায়ী পূর্ববর্তী 'থিয়েটার রয়েল' ও 'ক্লাসিক' থিয়েটারে (পূর্ববর্তী 'স্টার') চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। একটু ভিন্নভাবে ফাদার লাঁফো সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে (একসময় যা ছিল সাঁ সুসি থিয়েটার) শিক্ষামূলক ছবি দেখাতেন। পরবর্তীকালে এঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে উৎসাহী হলেন বাঙালিরা, অর্থাৎ শুরুতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসা ও পরে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হলেন তাঁরা।

কলকাতায় বাঙালি হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন। তিনি শুরুতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসায় যুক্ত হন, তার থেকেই নির্মাণে উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং এই নির্মাণে তিনি প্রথমেই তৎকালীন মঞ্চের জনপ্রিয় প্রযোজনাগুলির স্বারস্থ হলেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যায় হীরালাল সেন ১৯০৩ থেকে ১৯০৪ এর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রযোজিত ও অভিনীত নাট্যপ্রযোজনার খণ্ড দৃশ্য গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে যে নাটকগুলির উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন সেগুলি সে সময়ে কোনও না কোনওভাবে সমাদৃত ছিল। যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'সীতারাম' নাটকে সীতারামরূপী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ঘোড়ার পিঠে চড়ে অভিনয়। 'আলিবাবা' নাটকে হুসেন চরিত্রের অভিনয়, এইভাবে 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল, 'হরিরাজ' (শেকস্‌পীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের রূপান্তর) নাটকের খণ্ড দৃশ্য, 'সরলা' নাটকের বিধুভূষণ চরিত্রের অভিনয় এবং 'বুদ্ধদেব' নাটকের খণ্ডিত অভিনয় দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলিতে মূলত অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন প্রবাদপ্রতিম নট ও প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাছাড়া বাংলা মঞ্চে জনপ্রিয় অপেরাধর্মী নাটক 'আলিবাবা'-র মর্জিনা ও আবদাল্লার নাচের দৃশ্য গৃহীত হল যাতে অভিনয় করলেন মঞ্চেরই কুসুমকুমারী ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। তারপর নাটক অভিনয়ের অবসরে এইসব চলচ্চিত্রায়িত দৃশ্যগুলি পর্দায় দেখানো শুরু হল। যদিও দৃশ্যগুলি মঞ্চে ছিল আলো-ঝলমল সবাক ও উত্তেজনা উদ্রেককারী দৃশ্য আর পর্দায় ছিল নির্বাক মূকাভিনয় মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

জাগে হীরালাল চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হওয়ার কালে মঞ্চেরই দ্বারস্থ হলেন কেন? পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র (অবশ্যই প্রাথমিক শিল্প ও অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল তাঁর কাছেও) যখন প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বহির্দৃশ্য গ্রহণে আগ্রহী সেখানে হীরালাল সেনও কেন বহির্দৃশ্য গ্রহণ না করে মঞ্চের প্রতি ধাবিত হলেন? অথচ আমরা জানি চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে দৃশ্য গৃহীত হতো প্রাকৃতিক আলোয়। আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্যে সাদামাটা সিলভার ও গোল্ডেন রিফ্লেক্টার ব্যবহার করা হতো। চিত্রগ্রহণ করা হতো ডেবরি ক্যামেরায়, যে ক্যামেরায় হাতে দম দিয়ে চারশো ফুটের বেশি চিত্রগ্রহণ সম্ভব ছিল না। ফলে ভাবতে অবাক লাগে এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মঞ্চপ্রযোজনাগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন চলচ্চিত্রায়নের জন্য। তাঁর এই আকর্ষণের হেতু কী? প্রথমত, হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরস্পরের বন্ধু ছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ নতুন কিছু প্রবর্তনে সবসময়েই উৎসাহী ছিলেন। রমাপতি দত্তের লেখা থেকে জানা যায়—'অমরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে করিবার জন্য অন্যান্য থিয়েটারের মতো কেবল বিদেশ হইতে আনীত ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবৃন্দের দ্বারা তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নির্ধারিত দৃশ্যের চিত্র উঠাইলেন।' ('রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ': রমাপতি দত্ত) এই বিশেষজ্ঞ আর কেউ নন, হীরালাল সেন। তিনি হীরালাল সেনকে নানাভাবে যেমন সাহায্য করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত সে সময়ে বিরল। এমনকি চলচ্চিত্র নির্মাণে স্টুডিওর জন্য জমিও কিনেছিলেন। এই প্রথম কারণ ব্যতীত হীরালাল সেনের উৎসাহের অন্য কারণ হল বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ সেসময় যেমন সমৃদ্ধ তেমনই জনপ্রিয়, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা নির্মাণকালে এই জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শিল্পমাধ্যমটির প্রভাব এড়াতে পারেননি। তৃতীয়ত নবতম মাধ্যমটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গেলে ও একই সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্য-লাভ করতে হলে মঞ্চই তখন একমাত্র উপযুক্ত স্থান যেখানে অনেক দর্শককে একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এবার বিষয়টি যদি দর্শকের চোখ দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখব সেসময়কার বাঙালি দর্শকরা পাশ্চাত্যদেশের মতো শুরুতেই উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। তারা কালেভদ্রে বায়োস্কোপ দেখত। ফলে মঞ্চে নাটকের সঙ্গে অধিকন্তু হিসাবে চলচ্চিত্র (যা সেই নাটকেরই খণ্ড চিত্ররূপ) দর্শন ধীরে ধীরে ভাল লাগতে থাকে, পরে তাই নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতারাও প্রথমে খণ্ড দৃশ্য পরে সমগ্র প্রযোজনা চিত্রায়িত করে ধীরে ধীরে নাট্যপ্রযোজনাতেই চলচ্চিত্র নির্মাণের তৃপ্তি খুঁজছিলেন। বস্তুত এই সৌদনও মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের এই নিবিড় সম্পর্ককে অনেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলেই মনে করতেন এবং চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে তা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। ডক্টর কালিদাস নাগ এক নিবন্ধে চলচ্চিত্র ও নাটকের এই সম্পর্ক বিষয়ে গৌরব করেই তাই লেখেন: 'Bengali films show an organic connection with the stage—the earliest and noblest of arts

in the whole of India—and therefore, I may venture to say that they simultaneously develop the screen and the stage actors and actresses and here Bengal resembles her Marath cousins, both equally proud of their stage.' (*'Bengal's Cultural Contribution to the Screen'*: Dr. Kalidas Nag.) ডক্টর নাগের এই গৌরবপূর্ণ উক্তি বাংলা চলচ্চিত্রের শুরুর কয়েক দশকের (নির্বাক ও সবাক উভয় যুগেই) ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু একইসঙ্গে এ প্রশ্নও জাগে—বাংলা নাটক ও বাংলা চলচ্চিত্রের এই নৈকট্য এবং সম্পৃক্তি চলচ্চিত্রকে সেসময় সমৃদ্ধ করেছিল না স্বাতন্ত্র রচনায় ও নিজস্ব ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

চলচ্চিত্র না নাট্যের চিত্ররূপ ?

চলচ্চিত্রের নির্মাণপর্বে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই চলচ্চিত্র মঞ্চের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই চলচ্চিত্র শিল্প দীর্ঘকাল প্রায় শতাধিক মঞ্চসফল নাট্যপ্রযোজনার উপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন ১৯০৩-এ নির্মিত এডুইন এস. পোর্টার পরিচালিত 'আঙ্কল টম'স কেবিন' আঙ্গিকে যতটা না চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তৎকালীন জনপ্রিয় মঞ্চ প্রযোজনার সেলুলয়েডে আবদ্ধ চিত্ররূপনাট্য। ফ্রান্সেও চলচ্চিত্র শুরুতে ব্যালে, অপেরা ও নাটকের উপর নির্ভরশীল। ১৯০৮ সালে Le Film d' Art 'নামে এক প্রোডাকশন কোম্পানির সৃষ্টি হয় যাদের সৃষ্ট অধিকাংশ চলচ্চিত্রই ছিল 'French National Theatre' এর বিভিন্ন সময়কার জনপ্রিয় মঞ্চ প্রযোজনার চলচ্চিত্রায়িত রূপ। এমনকি এরা সেসময়ে কোনও-কোনও ব্যালে অনুষ্ঠানের সরাসরি চিত্রগ্রহণ করে তাকে চলচ্চিত্র বলে চালাতে দ্বিধা বোধ করেনি। পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতির কথা বলতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক ই. বেভার লিখেছেন : 'The early motion-picture director, however, did not immediately take full advantage of the naturalistic possibilities of the medium. Because the filming of existing plays was the simplest way of producing dramatic Stories, pioneering film-makers borrowed freely from the stage, not always recognizing that what was regarded as theatrical realism was not necessarily cinematic realism. Most early film-makers who photographed parts of stage play merely recorded the event.' এমনকি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সময় 'The methods of changing scenery and location utilize stage machinery rather than the editing devices of the motion picture.' (*On Flim* : Frank E. Beaver) প্রকৃতপক্ষে বেভারের দর্শানো এই কারণগুলি শুধুমাত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেই প্রযোজ্য নয়, ভারতবর্ষের আদিযুগ—বিশেষ করে হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্র

নির্মাণের ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রযোজ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের এই মঞ্চনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে বেশি সময় লাগেনি এমনকি তারা অতি দ্রুত খুঁজে পেল চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। অথচ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দেশ ১৯৩০ পর্যন্ত বিশ্বের চারটি দেশের একজন ছিল। যাই হোক ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই মঞ্চনির্ভরতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে যদি দেখি তাহলে বোঝা যাবে তার যথার্থ রূপ। এক, বিষয়বস্তু বা কাহিনীর প্রয়োজনে নাটকের কাছে আশ্রয়গ্রহণ। দুই, চিত্রকে আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জনমূলক করে তোলার জন্য মঞ্চ উপকরণ অর্থাৎ স্টেজ টেকনিক ও ট্রিকস ইত্যাদির মিশ্রণ। তিন, মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই চলচ্চিত্রে গ্রহণ করার ফলে মঞ্চ অভিনয়ের বাহুল্য। চার, সঙ্গীতের ব্যবহার। সর্বোপরি এইসময়কার চলচ্চিত্রগুলিতে ক্যামেরার ভূমিকা ছিল নেহাতই প্রেক্ষাগৃহের মাঝের আসনে উপবিষ্ট দর্শকের মতো। মঞ্চের পরিসরে যা ঘটছে বা ঘটানো হচ্ছে তাই তার দেখার বিষয়, তার বেশি কোনও ভূমিকা ছিল না।

নির্বাক সে যুগ

চলচ্চিত্রের আদিতে কলকাতায় যখনই কোনও কোম্পানি চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা মঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে নানাভাবে। শুরুতেই হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের যৌথ প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে, এরপরেই নাম করতে হয় মদন কোম্পানির (যা ম্যাডান কোম্পানি বলে পরিচিত) যারা ১৯১২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত কলকাতা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে এমনকি, সিংহল, বর্মা ও সিঙ্গাপুরেও চলচ্চিত্র শিল্পের অধিপতি ছিল। একসময় তারা প্রায় ১৭২ টি চিত্রগৃহের মালিক ছিল। কলকাতায় তাদের পার্সি ও বাংলা থিয়েটারের কয়েকটি নাটমঞ্চ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখ্য কোরিন্থিয়ান (বর্তমানে 'অপেরা' চিত্রগৃহ), মুনলাইট, অ্যালফ্রেড (বর্তমানে 'গ্রেস') কর্নওয়ালিস (বর্তমানে 'উত্তরা') ও ক্রাউন (বর্তমানে 'শ্রী') নাটমঞ্চ। এঁরা যখন চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন করলেন নিজস্ব মঞ্চের কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। এইভাবে তাঁরা যেমন পার্সি থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিলেন তেমনই নিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত উর্দু নাট্যকার আগা হাসান কাশ্মিরীকে। বাংলা নাট্যজগত থেকে নিলেন পর্যায়ক্রমে শিশিরকুমার ভাদুড়ি, মধু বসু, নরেশচন্দ্র মিত্রের মতো অভিনেতা, পরিচালকদের। কালীশ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখেছেন : '...দেশীয় ও বিদেশীয় ছবি দেখিয়েও ম্যাডান কোম্পানী যখন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছিল না—তখন চিত্র নির্মাণে হস্তক্ষেপ করল। কোরিন্থিয়ান ও আলফ্রেড থিয়েটারের নট-নটীদের নিয়ে ম্যাডানের সুযোগ্য ম্যানেজার রুস্তমজী দোতিওয়ালা, চিত্রশিল্পী জ্যোতিষচন্দ্র সরকারের সহায়তায় 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'মহাভারত', 'নল-দময়ন্তী', 'ধ্রুব-চরিত্র' প্রভৃতি হিন্দি চিত্র নির্মাণ করেন। বাঙালি ও ফিরিঙ্গি মেয়েদের সংগ্রহ করে বাংলা চিত্র নির্মাণেও হস্তক্ষেপ করেন।' (বাংলা চলচ্চিত্র

শিল্পের ইতিহাস : কালীশ মুখোপাধ্যায়)। উপরোক্ত চলচ্চিত্রগুলির সবকটিই ছিল পার্সি থিয়েটারের অনুসৃত। এই কোম্পানির তোলা বাংলা সাব-টাইটেল যুক্ত কাহিনী চিত্র 'শিবরাত্রি' (১৯২৬) যার কাহিনী রচয়িতা ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর অভিনয় করেছিলেন বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই। একইভাবে অন্যেরা সিনেমা কোম্পানি যখন ১৯১৬-১৭ সালে চিত্রনির্মাণ শুরু করে তখন তাদের প্রথম ছবি ছিল 'বিষবৃক্ষ' নাটকের কয়েকটি খণ্ড দৃশ্য যা মনমোহন থিয়েটারে (পূর্বের 'স্টার') দেখানো হয়েছিল। এরপর এই কোম্পানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি মঞ্চনাটকের খণ্ড দৃশ্য সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করে চিত্রগৃহ ও মঞ্চে দেখাতে থাকে। 'চন্দ্রশেখর' চিত্রটিতে সেসময় অভিনয় করেছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, নীহারবালা প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'কৃষ্ণসুদামা' নামের একটি চিত্র গ্রহণ করেন তাঁরা যার চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার পড়েছিল অহীন্দ্র চৌধুরির উপর। অভিনয়ে ছিলেন সন্তোষ সিংহ ও অন্যান্যরা। সে সময়কার জনপ্রিয় আর একটি নাটক 'বাসবদত্তা'ও তখন চিত্রায়িত হয়। বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগকে মূলত ন্যাডান কোম্পানির যুগ বলা হলেও সেসময় আরও কয়েকটি কোম্পানি চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী ছিল এবং তারা সেসময় যেসব খণ্ড ও পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করে তার বেশ কয়েকটিরই ছিল নাটকের আদলে কাহিনী-বিন্যাস। এইভাবে নির্মিত তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির 'আঁধারে আলো' অন্যতম, তার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিশির ভাদুড়ি। নরেশ মিত্র পরিচালনা করেছিলেন 'মানভঞ্জন' ও 'চন্দ্রনাথ' এরমধ্যে স্বিতীয়টি উপন্যাস হলেও নাটক হিসাবেও জনপ্রিয় ছিল। যেমন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস্ ফিল্মস্ লিমিটেড এক-সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' নাটকটি চিত্রায়িত করতে আগ্রহী হল কেননা নাটকটি তখন মঞ্চে শতাধিক রজনী অতিক্রম করেছে। চিত্র নির্মাণের সময় মূলত তাঁরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন যাঁরা মঞ্চে মূল চরিত্রগুলির অভিনয় করছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৪ মে সাত রিলের এই ছবি মুক্তিলাভ করল এবং মঞ্চের মতোই জনপ্রিয় হল। কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই ছবিখানি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবার সময় দর্শক সমাজের হাসি রোলে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ার উপক্রম হতো।' (বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস : কালীশ মুখোপাধ্যায়)।

নির্বাক যুগে বাংলা মঞ্চ থেকে যেসব নাটক সরাসরি বা ঈষৎ ভিন্নরূপে চলচ্চিত্রে আমদানি হয়েছিল (খণ্ড চিত্র বাদ দিয়ে) সেগুলি হল—'বিল্বমঙ্গল' (১৯১৯)'মোহিনী' বা 'একাদশী' (১৯২২) 'কমলে কামিনী' (১৯২৪) 'মিশর রাণী' (১৯২৫) 'শিবরাত্রি' (১৯২৬) 'প্রফুল্ল' (১৯২৬) 'জয়দেব' (১৯২৭) 'জনা' (১৯২৭) 'ভ্রান্তি' (১৯২৮) 'সরলা' (১৯২৮) 'শঙ্করাচার্য' (১৯২৮) 'শান্তি কি শান্তি' (১৯২৮) 'অলীকবাবু' (১৯৩০) বিবাহ-বিভ্রাট(?) বেলার কীর্তি(?) ইত্যাদি। নির্বাক যুগে নির্মিত এদেশীয় চলচ্চিত্র বাংলা ও পার্সি থিয়েটারের কাছে ঋণী ছিল যতটা না পরিমাণগত দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি বিন্যাস ও আঙ্গিকগত দিক থেকে। বিষয়বস্তু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা সম্ভব

ছিল না। যেহেতু নাটক মূলত সংলাপনির্ভর আর চলচ্চিত্র তখন নির্বাক। ফলে সে গ্রহণ করল মঞ্চের টেকনিক ও অভিনয়। তখনকার চলচ্চিত্রে কীভাবে স্টেজ টেকনিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার চমৎকার উদাহরণ ১৯২৮ সালে নির্মিত ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস প্রযোজিত 'শঙ্করাচার্য' ছবিটি। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের লেখা 'শঙ্করাচার্য' নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার সময় পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব বর্তেছিল কালী-প্রসাদ ঘোষের উপর। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন : 'শঙ্করাচার্যের চিত্রনাট্য যখন লিখি তখন ফিল্ম তোলা ও চিত্রনাট্য লেখা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না,...এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক চিত্র "জয়দেব" তখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। "জয়দেব" সে যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। থিয়েটারের সংগীতবহুল "জয়দেব" নাটককে কী করে নির্বাক চলচ্চিত্রে পরিণত করে সাফল্য লাভ করেছেন পরিচালক মশায়, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ যখন একটা গরুর মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ বেরুলেন, আর সমস্ত দর্শক বিপুল আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন—তখন তা দেখে আমি মনকে সমঝালাম যে এই হচ্ছে তা হলে নির্বাক চলচ্চিত্র লেখার আসল কায়দা! অর্থাৎ ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক বইয়ে আজগুবি সব স্টান্ট থাকা দরকার, নইলে দর্শক মেতে উঠবে না।' (রূপ-মঞ্চ চতুর্দশবর্ষ, ১৩৬৯) ফলে দর্শক মাতানো যাবে এই ভাবনাতেই তিনি শঙ্করাচার্যের চিত্রনাট্য লেখার সময় অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন এবং সে কারণেই মঞ্চের ট্রিকগুলিকে পর্দায় আমদানি করলেন। বাকি ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডাক পড়ল। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ি, ধীরেন গাঙ্গুলি, নিভাননী দেবী, রেণুবালা প্রমুখ সেসময়কার মঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে তখনকার চলচ্চিত্রে ভিস্যুয়ালের থেকেও জোর দেওয়া হচ্ছে ট্রিক ও ড্রামাটিক-অ্যাকশনে আর এই ট্রিক ও ড্রামাটিক-অ্যাকশন সরাসরি আমদানি করা হচ্ছে পার্সি থিয়েটার ও বাংলা নাট্যপ্রযোজনা থেকে।

বাংলা মঞ্চে দর্শককে আপ্লুত করার জন্যে কী ভাবে ট্রিক ব্যবহার করা হতো আর কখনও-কখনও কেমন দুর্ঘটনা ঘটত তা এখানে বর্ণনা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না বরং দৃষ্টান্তেই উদ্দেশ্য যে এক ছিল তা বোঝা যাবে। বিনোদিনী তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন : 'একবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটোনিয়া সেজে আমি শূন্য পথে আসছি, এমন সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে আমি ধপ্ করে স্টেজের মাঝে এসে পড়লাম।... ওদিকে সুধী দর্শকবৃন্দের হাতের তালি হাতেই রয়ে গেল।' স্টার থিয়েটারে 'নল-দময়ন্তী' নাটকে : 'একটি সরোবরের দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্য-স্থলের পদ্মটি সবচেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটি কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনভাবে একে একে ছয়জন কমলবাসিনী বার হয়ে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হত।...

সরোবরের এই দৃশ্যটি দেখতে ভারি সুন্দর হত। জহর ধর মহাশয় এই সিনটা সাজিয়েছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ ছিলেন।' (আমার কথা : বিনোদিনী দাসী) তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলা মঞ্চের আদিযুগে যেসব ট্রিক দিয়ে বা মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে দর্শককে মুগ্ধ করে রাখার চেষ্টা হতো ঠিক সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছিল চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে, হোক না সে গল্প বা উপন্যাস কিংবা নাটকের চিত্ররূপ।

সবাক যুগের শৈশবে

বাংলা চলচ্চিত্র জগত নির্বাক যুগে যেমন মঞ্চের ট্রিকগুলিকেই অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছিল চিত্রকে অলৌকিক ও নাটকীয় করে তোলার প্রয়োজনে আর সবাক যুগে এসে সে আশ্রয় গ্রহণ করল কাহিনীতে। এই কাহিনী যেমন নেওয়া হতো গল্প বা উপন্যাস থেকে তেমনই নেওয়া হতে থাকল মঞ্চখ্যাত নাটক থেকেও। এর সঙ্গে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, চমক ও সংলাপ ব্যবহারে মূলত নাটককেই আদর্শ বিবেচনা করেছিলেন সে সময়কার পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকারগণ। হামিদউদ্দিন মেহমুদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'The verse-dance-music tradition of classical Sanskrit drama, which persisted in the Indian theatre, provided the Indian film maker the model for the talkie. The first victim was speech itself.' শুধু তাই নয়, 'Hence, the Hindi film took on the Parsi theatre. Whereas the historical and mythological subjects still marked a thematic continuity form from the silent era, the dramatic styles of each language governed the acting and presentation styles of a film in that language. In Bengal, the stage and literature were quite powerful and the Bengali film borrowed heavily from both. (*'The Kaleidoscope of Indian Cinema'* : Hameeduddin Mahmood.) এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। হিন্দি চলচ্চিত্র যেমন প্রত্যক্ষভাবে পার্সি থিয়েটার প্রভাবিত ছিল একইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রও নির্বাক যুগের পর সবাক যুগের কয়েক দশকে বাংলা ও পার্সি মঞ্চের কাছে বহুলাংশে ঋণী। বাংলা মঞ্চের কাছে ঋণী মূলত বিষয় ও বিন্যাসে আর পার্সি মঞ্চের কাছে ঋণী মঞ্চমায়া বা চমৎকারিত্বের প্রদর্শনের উপকরণ সংগ্রহে। একইভাবে আদিতে (এমনকি আজও) বাংলা চলচ্চিত্র, বিশেষত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র বাংলা লোকনাট্য যাত্রা ও মঞ্চনাট্যের কাছে ঋণী আর একটি বিশেষ উপাদানের জন্য।

সবাক যুগের শুরু থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের অধিকাংশই সঙ্গীতবহুল। যদিও চারিত্র বৈশিষ্ট্যে ছবিটি গীতিচিত্র নয় তবুও একাধিক সঙ্গীতের ব্যবহার ভারতীয় এবং বাংলা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণকে অবশ্য কেউ কেউ সৎ বলে মনে করে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কোনও কোনও গবেষক আবার এই ব্যবহারের মধ্যে খুঁজে

পান যৌনতার বিকল্প ব্যবহার। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে নর-নারীর মিলন ও ভাবের আদান-প্রদান যখন সরাসরি দেখানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই গানের ব্যবহার করা হয় আমাদের চলচ্চিত্রে। লেখক কমলকুমার মজুমদার অবশ্য মনে করতেন আমাদের চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার কখনওই অপ্রয়োজনীয় নয় বরং বড় বেশি প্রাসঙ্গিক : 'পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ছবিতে এত গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে ; তার নাম দেয় "গীত-চিত্র"। তারা গান বলতে বোঝে হয়তো চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে গভীরতাও আছে ; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে সেখানে তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি ; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ডুবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক সুখের কি দুঃখের, গান আছে কিনা জানতে চাই সবার আগে আমরা; পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফী আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি, তার পরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের।' (চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার : কমল মজুমদার) এখন চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার সঙ্গত না অসঙ্গত সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা বলতে পারি ভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রে গানের এই ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবত লোকনাট্য ও মঞ্চনাট্যেরই প্রভাবে।

মন্দভালর দ্বন্দ্ব

যাই হোক, এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে না বিপথগামী করেছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আদিতে চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি ও মঞ্চপ্রভাব চলচ্চিত্রকে নিশ্চিতভাবেই সমৃদ্ধ না করুক নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। তৎকালীন বাংলায় মঞ্চ জগত (শুধু বাংলা নয় পার্সি মঞ্চও) যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, সতু সেন, নির্মলেন্দু লাহিড়ি প্রমুখ পরিচালক ও অভিনেতারা তখন মঞ্চের মধ্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতোই দীপ্যমান ফলে তাঁদের সহায়তায় ও নাট্যের অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে চলচ্চিত্রকে তার নির্মাণপর্বে অনেক বাধা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। অনেক সহজেই সে দর্শকের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় চলচ্চিত্রের এই মঞ্চপ্রীতি ও প্রভাব নবতম শিল্পমাধ্যমটিকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে আরও আড়ষ্ট ও পঙ্গু করে তুলছিল। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র যে দুটি ভিন্ন শিল্প ও মাধ্যমগত দিক থেকেও দুটিতে যে বিশাল তফাৎ রয়েছে, চলচ্চিত্রের আবেদন যে আরও ব্যাপক, চলচ্চিত্র যে সর্বত্রগামী একথা বুঝতে বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের অনেক সময় লেগেছিল। চলচ্চিত্র যে নিছক কাহিনীর চিত্রায়িত রূপ নয়, নয় সংলাপ-সর্বস্বতা কিংবা কেবল দাপটে অভিনয় ও চমক, তার যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে যা একেবারে নিজস্ব এবং ইতিপূর্বে আর কোনও শিল্পেই তা প্রতিভাত হয়নি সে কথা বুঝতে

বাংলা চলচ্চিত্রকে বেশ কটি দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপরে আবার দেখা গেল বাংলা নাট্যমঞ্চ কখন যেন চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে, অর্থাৎ চলচ্চিত্রের টেকনিক, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দ্রুতগমন এমনকি সংলাপের সংযত ব্যবহার, অভিনয়ে স্বাভাবিকতা এই সবই ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুসৃত হতে থাকল। এ অবশ্য ভিন্ন এক প্রবেশ।

বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগে চিত্রায়িত উল্লেখযোগ্য খণ্ডনাট্যদৃশ্য

কলকাতায় সবাক ছবি প্রথম দেখানো হয় গ্লোব থিয়েটারে ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর। এদেশে নির্মিত সবাক ছবি প্রথম দেখানো হয় ক্রাউন থিয়েটারে (বর্তমান উত্তরা) ১৯৩১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, গায়িকা মুন্নি বাঈয়ের 'জয় জয় ভবানীপতি' গান ও চিত্রের মাধ্যমে। এরপর ১৩ মার্চ ওই চিত্রগৃহে দেখানো হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে গান গাইছেন, এছাড়া বেশ কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য—১. অহীন্দ্র চৌধুরি অভিনীত 'আলমগীর' ও 'মৃণালিনী'র দৃশ্য। এই দুটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরির কণ্ঠস্বর কিছুটা ভাঙা-ভাঙা শোনা গিয়েছিল যা যান্ত্রিক ত্রুটি বলেই মনে হয়, কারণ পরবর্তীকালে তিনি মঞ্চের মতোই চলচ্চিত্রে সাফল্যলাভ করেছিলেন। ২. দানীবাবু অভিনীত 'প্রফুল্ল' নাটকের 'একটি পয়সা দাও না'—সেই বিখ্যাত সংলাপ। ৩. 'সীতা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যে নির্মলেন্দু লাহিড়ির রাম চরিত্রে অভিনয়। ৪. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকের গোবিন্দলাল চরিত্রে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। ৫. 'চাঁদবিবি' নাটকের ইব্রাহিম চরিত্রে ভূমেন রায়ের অভিনয়। ৬. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকের রোহিণী চরিত্রে সরযূবালার এবং ৭. 'আবুহোসেন' নাটকের রোশেনা, 'চাঁদবিবি' নাটকের ফয়জান ও 'রংবাহার' নাটকের বীণা চরিত্রে রেণুবালার অভিনয়। এসবগুলিরই প্রযোজক ছিলেন মদন (Madan) কোম্পানি।

শুরুর এই প্রচেষ্টা মোটামুটিভাবে সাফল্যলাভ করায় ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রযোজক কোম্পানি এগিয়ে এল সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজে এবং স্বাভাবিক প্রবণতায় আশ্রয় নিল উপন্যাস ও মূলত নাট্যকাহিনীতে। এগুলি জনপ্রিয়তা পেল, কখনও স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে উঠল আর অধিকাংশই মঞ্চপ্রযোজনার ব্যর্থ অনুকরণ হিসাবে ইতিহাসের পাতাবন্দী হয়ে থাকল।

পূর্ণ দৈর্ঘ্য সবাক নাট্যচিত্রের কয়েক দশক

১৯৩২

নটীর পূজা : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় 'নটীর পূজা' নাটকটি কয়েক রাত্রি অভিনয় করে। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অভিনয়ও বেশ সুন্দর হয়েছিল বলে সে সময়কার পত্র-পত্রিকার সমালোচনা থেকে জানা যায়।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড এই অভিনয়েরই সবাক চিত্রগ্রহণ করে এবং তা চলচ্চিত্র হিসাবে মুক্তিলাভ করে ২২ মার্চ, ১৯৩২, চিত্রা (বর্তমান মিনার) প্রেক্ষাগৃহে।

পুনর্জন্ম : নিউ থিয়েটার্স এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসন 'পুনর্জন্ম' চিত্রায়িত করে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী স্বয়ং ও অমর মল্লিক, দেববালা প্রমুখ অভিনয়ে ছিলেন।

ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয় ২ এপ্রিল, ১৯৩২, চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে।

চিরকুমার সভা : প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' প্রহসনটি চিত্রায়িত হয় নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৩২ সালে।

অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ফণি বর্মা, নিভাননী দেবী, সুনীতিবালা, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য চরিত্রে মলিনা দেবী, চানি দত্ত, অনুপমা প্রমুখরা।

চিত্রটি সম্পর্কে তৎকালীন 'চিত্রপঞ্জী' পত্রিকার মত লক্ষণীয়—'প্রেমাঙ্কুর বাবু 'চিরকুমার সভা' নাটকের কয়েকটি অংশ বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনও অদল বদল করেন নি। সমস্ত নাটকখানি স্টেজের টেকনিকে তোলা হয়েছে। এ কারণে এবং বহির্দৃশ্যের অভাবে ছবিখানি অমন প্রাণহীন এবং অসাড়।' (চিত্রপঞ্জী, শ্রাবণ ১৩৩৯, ৪র্থ সংখ্যা)

পল্লীসমাজ : 'পল্লীসমাজ' মূলত শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হলেও ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যমঞ্চে তা শিশির ভাদুড়িরই পরিচালনায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ফলে চিত্রায়িত করার সময়ও চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল শিশির ভাদুড়ির উপর।

ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, শৈলেন চৌধুরি, যোগেশ চৌধুরি, অমলেন্দু লাহিড়ি, নৃপেন রায়, তারাকুমার ভাদুড়ি, কঙ্কাবতী দেবী, প্রভা দেবী প্রমুখ।

ছবির বিন্যাস বিষয়ে 'চিত্রপঞ্জী' মন্তব্য করে : 'পল্লীসমাজ আমাদের তৃপ্ত করেছে বটে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারে নি। ... সমস্ত ছবিখানি স্টেজ টেকনিকে তোলা হয়েছে। স্ক্রীন টেকনিক খুব অল্পই আছে।' (চিত্রপঞ্জী, শ্রাবণ ১৩৩৯, ৪র্থ সংখ্যা)

১৯৩৩

সীতা : আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি সবাক যুগের শুরুতে খণ্ড দৃশ্য চিত্রায়িত করার সময় 'সীতা' নাটকের খণ্ড দৃশ্যে নির্মলেন্দু লাহিড়ির রাম চরিত্রে অভিনয় দৃশ্যায়িত করা হয়। তবে এটি ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সীতা' নাটক। মঞ্চে অবশ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনায় 'সীতা' যার নাট্যকার ছিলেন যোগেশ চৌধুরি। যাই হোক এই যোগেশ চৌধুরির 'সীতা' নাটকটি শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনা ও অভিনয় নিপুণতায় বাংলা মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করায় ১৯৩৩ সালে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড নাটকটিকে চিত্রায়িত করতে উৎসাহী হয় এবং

পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিশির ভাদুড়িকেই। অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, তারাকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরি, কঙ্কাবতী, প্রভা দেবী প্রমুখ।

'সীতা' মঞ্চে যতটা সাফল্য পেয়েছিল চিত্রে ততটা সফল হতে পারেনি। সে ক্ষেত্রেও কারণ ছিল একটাই—মঞ্চের বিষয়কে হুবহু চিত্রে রূপায়িত করার সীমাবদ্ধতা।

বিল্বমঙ্গল : গিরিশ ঘোষের ভক্তিমূলক নাটকগুলির মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। ১৯৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রযোজনায় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রূপান্তরিত হয় মঞ্চনাটক থেকে চলচ্চিত্রে।

অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, যোগেশ চৌধুরি, রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাণীবালা প্রমুখ।

ছবির নির্মাণ সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা মন্তব্য করে :

'বিল্বমঙ্গল চিত্রখানি প্রায় সর্বদিক দিয়েই মঞ্চাভিনীত বিল্বমঙ্গলকে অনুসরণ করেছে।... অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে চিত্রখানি মধ্যম শ্রেণীর হয়েছে।' (দেশ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩)

এই বছরই বাংলা ভাষার চিত্র ছাড়াও বাংলা নাটকের আশ্রয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়। যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ এবছরই 'সীতা' নাটকটিকে হিন্দি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার দায়িত্ব দেয় দেবকীকুমার বসুকে। এছাড়া, নিউ থিয়েটার্স ও 'সীতা' নাটকের চিত্রায়ন করবে একথা তৎকালীন চিত্রসংবাদে প্রচারিত হয়।

এ. আর. কারদারের পরিচালনায় উর্দুতে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চিত্রনির্মাণ শুরু হয় এ বছরই। পরিচালক মধু বোস সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা নাটক 'বুমেলা' উর্দুতে নির্মাণে উদ্যোগী হন।

১৯৩৪

ভক্ত ধ্রুব : পায়োনিয়ার ফিল্ম সর্বপ্রথম যে সবাক চিত্র নির্মাণ করে তা গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'ধ্রুব', ১৯৩৪ সালে। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, এছাড়া ছিলেন শ্রীমতী আঙুরবালা, পারুলবালা, মিস্ শরিফা প্রমুখ।

চলচ্চিত্রের মানে 'ভক্ত ধ্রুব' অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিত্র হিসাবে নিন্দিত হয় সে সময়েই। ১ জানুয়ারি, ১৯৩৪-এ চিত্রটি ক্রাউন মঞ্চে মুক্তিলাভ করে।

চাঁদ সদাগর : নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটকটি মঞ্চে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল চিত্ররূপেও তেমনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এককালীন বাহান্ন সপ্তাহ চলেছিল ছবিটি সেসময়।

এটি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স নির্মিত প্রথম সবাক চিত্র যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন

প্রফুল্ল রায়। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীহারবালা, পদ্মাবতী, দেববালা, শেফালিকা (পুতুল) প্রমুখ।

মন্মথ রায়ের চিত্রনাট্য ও সংলাপ সমালোচিত হয়েছিল যদিও অভিনয় ও দৃশ্যপটের প্রশংসা করেছিল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা।

ছবিটি ১৯৩৪ সালের ১৭ মার্চ ক্রাউন মঞ্চে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

মহুয়া : এটি নাট্যকার মন্মথ রায়ের অপর এক মঞ্চসফল নাটক। ১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার ও পরিচালনার দায়িত্ব দেয় হীরেন বসুকে। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী।

১৯৩৪-এর ১ সেপ্টেম্বর চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তিলাভ করে।

১৯৩৫

বিরহ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা প্রহসনের একটি হল 'বিরহ'। কালী ফিল্মস নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার জন্য চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব দেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীকে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তখনকার মঞ্চের খ্যাতনামা গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ি, রাণীবালা প্রমুখ।

ছবিটি প্রথম দেখানো হয় ১৮ মে, ১৯৩৫ ক্রাউন মঞ্চে।

প্রফুল্ল : নির্বাক যুগে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক হিসাবে মঞ্চসফল হওয়া সত্ত্বেও চিত্ররূপে সাফল্য পায়নি কিন্তু সবাক যুগে এসে পুনরায় নির্মিত হয়ে সাফল্য-লাভ করেছিল। কালী ফিল্মস প্রযোজিত চলচ্চিত্রের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। এ ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। অভিনয়ে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরি, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরি, প্রভা দেবী, রাণীবালা, নগেন্দ্রবালা, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি, শীতল পাল, তারাকুমার ভাদুড়ি, শেফালিকা, রাজলক্ষ্মী, চুনীবালা প্রমুখ।

ছবির বিষয়ে সেসময়কার দুটি পত্রিকা দুরকম মন্তব্য করেছিল :

ক) 'সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে রঙ্গমঞ্চে যে নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, চিত্রে তাহার কোন স্থান থাকে না, কিন্তু কালী ফিল্মের প্রফুল্ল চিত্রখানিতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে।' (দেশ, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

খ) 'The treatment of the story though a bit stagey yet the suspense and grip has been maintained all through on account of good continuity and quick tempo.' (*Depali*, 20 Dec. 1935)

ছবিটি মুক্তিলাভ করে উত্তরা চিত্রগৃহে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে।

হরিশ্চন্দ্র : পায়োনিয়ার ফিল্মস প্রযোজিত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। অভিনয়ে শান্তি গুপ্তা প্রশংসা লাভ করেছিলেন। চিত্রনাট্য হয়েছিল মণ্ডনানুযায়ী। ছবিটি সেসময় দেখানো হয়েছিল বিজলী ও ছবিঘরে। প্রথম প্রদর্শন ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৫-এ।

খাসদখল : নাট্যকার অমৃতলাল বসুর অপর একটি নাটক সোনেরা পিকচার্স চিত্রায়িত করে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। অভিনয় করেছিলেন যোগেশ চৌধুরি, চানি দত্ত, নগেন্দ্রবালা, রেণুকা প্রমুখ। চিত্রনাট্যর ত্রুটিতে চলচ্চিত্রটি সাফল্য পায়নি।

ছবিটি মুক্তিলাভ করে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে।

তরুবালা : সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় পায়োনিয়ার ফিল্ম অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকটি চিত্রায়িত করে মঞ্চের মতো সফলতা না পেলেও কিছুটা সফল হয়েছিল। অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি, অহীন্দ্র চৌধুরি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, পদ্মাবতী দেবী, নগেন্দ্রবালা, হরিসুন্দরী (র‍্যাঙ্কি) প্রমুখ। চিত্রনাট্য রচনা করা হয়েছিল মঞ্চের অনুকরণেই। এ বিষয়ে সেসময়কার এক পত্রিকার মন্তব্য :

'...Some of the scenes he [Sushil Mazumdar] has lapsed into stage technique.' (*Depali*, 7 Feb. 1936)

মানময়ী গার্লস স্কুল : এই নাটক লিখে নাট্যকার রবীন্দ্রমোহন মৈত্র রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে বাণিজ্যিক মঞ্চে ও সৌখিন নাট্যদলের দ্বারা। রাধা ফিল্ম এই কমেডিকে চলচ্চিত্রায়িত করার জন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেয় জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি প্রায় মঞ্চের নাটকটিকেই সরাসরি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন।

মঞ্চে মানসের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলি অভিনয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। চলচ্চিত্রেও একই ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এছাড়া অভিনয়ে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, কানন দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রমুখ।

১৯৩৬

পরপারে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা এই সামাজিক নাটক চন্দ্র ফিল্মস্ চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে যতীন দাসের পরিচালনায়। চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা বিষয়ে সেসময়কার 'সাহানা' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল এরকম :

'...যাঁরা পরপারে নাটক পড়েননি (যদিও তাঁদের সংখ্যা অল্প) তাঁরা যে সহজেই গল্পাংশ বুঝতে পারবেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু পরিচালক ছবির পর্দায় গল্পাংশ interesting করে তুলতে পারেননি। সেইজন্যেই ছবি দেখলে মনে কোনও ছাপ পড়ে না।' (সাহানা, ১১ জুলাই, ১৯৩৬, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা)। ছবিতে

অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নিভাননী দেবী প্রমুখ। ছবির প্রথম প্রদর্শন ৪ জুলাই, ১৯৩৬ চিত্রাতে।

পথের শেষে : ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মস্ প্রযোজিত, জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি মূলত নাট্যকার নিশিকান্ত বসু রায়ের লেখা সামাজিক নাটক।
এ ছবিকে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরি, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলি, জ্যোৎস্না গুপ্তা, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এসবের পরেও নাটকটি চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি কারণ—'মঞ্চের অভিনয়কে সরাসরি চিত্রে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল' (বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র : নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়)।

বাঙালী : ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সামাজিক নাটক 'বাঙালী' একসময় মিনার্ভা মঞ্চে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল তেমনই যাত্রা ও চলচ্চিত্রেও তা রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত চারু রায় পরিচালিত এই ছবি মঞ্চনাটক থেকে কিছুটা ভিন্নতর হয়েছিল বলে তৎকালীন এক পত্রিকার মন্তব্য : 'মূল নাটক আমরা পড়েছি, মঞ্চে তার অভিনয়ও দেখেছি। মূল নাটকে গল্পাংশ ছিল অতি দুর্বল—মাত্র বাঙালীর জীবন, নাটকের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যসমষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না মোটেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কয়েকটি ফুল, পরিচালক চারু রায় সেগুলি কুড়িয়ে গল্পের সূত্রে যেটির পর যেটি সাজে, সেইভাবে গেঁথেছেন এই চিত্রমালিকা যার রূপ হয়েছে অনবদ্য।'
(সাহানা, ২২ আগস্ট, ১৯৩৬, প্রথম বর্ষ)

আবর্তন : নাট্যকার নিশিকান্ত বসু রায়ের 'ধর্ষিতা' নাটক অবলম্বনে সতু সেন পরিচালনা করেন 'আবর্তন'। অভিনয়ে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী, শান্তি গুপ্তা, প্রভা দেবী, রাণীবালা প্রমুখ।
ছবিটি মুক্তিলাভ করে ১৯৩৬-এর ৯ মে 'শ্রী' চিত্রগৃহে।

১৯৩৭

টকী অব টকীজ : শিশির ভাদুড়ির পরিচালনায় জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' মঞ্চে প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিল। এই মঞ্চসফল নাটকটি কালী ফিল্মস্ শিশির কুমার ভাদুড়ির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত করার সময় নাম হয় 'টকী অব টকীজ'। অভিনয় করেছিলেন মঞ্চেরই শিল্পীরা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাটকটিতে পূর্বেই অভিনয় করতেন যেমন শিশির ভাদুড়ি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, কঙ্কাবতী এছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণকালে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তুলসী লাহিড়ি, রাণীবালা প্রমুখ।
মঞ্চসফল এই নাটক যখন চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয় তখন তৎকালীন প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই এর ব্যর্থতার কথা বলেছে :
'টকী অব টকীজ চিত্রখানি দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। শিশির কুমার অর্ধোন্মাদ অধ্যাপকের ভূমিকায় অবশ্য চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিনয়টুকু

ছবির সবকিছু নয়। ছবির অন্যান্য দিক যেমন চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি—সেইগুলি অত্যন্ত দুর্বলভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের 'রীতিমত নাটক'-এর সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।' (দেশ, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৭)

ছবিটি ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে উত্তরা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে।

আলিবাবা : ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই গীতিনাট্য তাঁর কালে এমনকি পরবর্তীকালেও মঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফলে চলচ্চিত্রে তা যে সাদরে গৃহীত হবে এটাই স্বাভাবিক। নির্বাক যুগে হীরালাল সেন ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত 'আলিবাবা' নাটকের নৃত্যদৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মধু বোস প্রথমে মঞ্চে ও পরে চলচ্চিত্রে তা রূপান্তরিত করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার কারণ তিনি মঞ্চ প্রযোজনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ দুটিকে পৃথকভাবে দেখেছিলেন। যদিও পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী সবই এক ছিল।

'আলিবাবা' মঞ্চপ্রযোজনাকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার বিষয়ে মধু বোস তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন : 'পরপর কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করে সি. এ. পি. সম্প্রদায় মঞ্চরসিকদের কাছে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ একটা আলোড়ন আনতে পেরেছিলেন।...এবার সব বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা উৎসাহ দিল—সি. এ. পি-র শিল্পীদের দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরী কর—আর করতে যদি হয় তবে 'আলিবাবা'ই করা উচিত।' (আমার জীবন : মধু বসু)

অভিনয় করেছিলেন মধু বসু, সাধনা বসু, সুপ্রভা মুখার্জি, বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার প্রমুখ। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজিত ছবিটি রূপবাণী চিত্রগৃহে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করে। তারপরের ইতিহাস আজ সবারই জানা।

হারানিধি : কালী ফিল্মস্ তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে এবং ব্যর্থ হয়। ছবির চিত্রনাট্য ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ছবি বিশ্বাস, প্রভা দেবী, রাণীবালা প্রমুখ। মুক্তিলাভ করেছিল ১ মে, ১৯৩৭ সালে শ্রী চিত্রগৃহে।

ছবিটির বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য : 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' বিখ্যাত নাটক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের সামাজিক আবহাওয়া যে রকম ছিল তাহারই চিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে যুগে এই ধরনের নাটকের বিশেষ সমাদর ছিল, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই,...গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকের যদি চিত্ররূপ দিতে হয় তবে তাহা এভাবে দিতে হইবে যাহাতে গিরিশ-প্রতিভা দর্শকের চক্ষের সম্মুখে অম্লান থাকে।' (দেশ, ৮ মে, ১৯৩৭)

ছিন্নহার : অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটক রাধা ফিল্মস্ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে। পরিচালনা করেছিলেন হরি ভঞ্জ। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, নরেশ মিত্র প্রমুখরা। ছবিটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এ উত্তরাতে মুক্তিলাভ করে।

এ বছরই নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'র হিন্দি সংস্করণের কাজ

শুরু করে। মূল অভিনেতা ছিলেন সায়গল।

১৯৩৮

খনা : নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং প্রশংসাও পেয়েছে। নেটোপলিটান পিকচার্স নাটকটিকে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে। ১৯৩৮ সালের ১২ নভেম্বর উত্তরাতে তা দেখানো হয় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অভিনয় করেছিলেন ছায়া দেবী (খনা), অহীন্দ্র চৌধুরি (বরাহ) প্রমুখ।

১৯৩৯

চাণক্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অবলম্বনে কালী ফিল্মস্ শিশির কুমার ভাদুড়ির চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় চিত্রায়িত করে 'চাণক্য' নামের ছবিটি। 'চন্দ্রগুপ্ত' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক যা মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে বহুবার অভিনীত হয়েছে। শিশির ভাদুড়িও এই নাটকের মঞ্চাভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাণকালে তিনি ততোধিক ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য : 'আলোচ্য চিত্রের যে পরিবর্তন ও রূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা শিশির প্রতিভার উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই।...কথাবহুল কাহিনীকেও সফল চিত্ররূপ দেওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ আমরা বার্ণাড শ-র 'পিগ মেলিয়ান' চিত্রের নাম করিতে পারি। মঞ্চে সুন্দর কথাবহুল স্থানগুলির প্রতি চিত্র-পরিচালকের নিরপেক্ষ ও অমায়িক হওয়া উচিত ছিল।' (দেশ, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৯) বস্তুতপক্ষে মঞ্চপ্রযোজনাকেই সেলুলয়েডে ধরে রাখা হয়েছিল,কারণ দৃশ্যগুলি ছিল মঞ্চের মতো এবং অভিনয় অবশ্যই মঞ্চাভিনয়, দৃশ্যসজ্জাও তাই।

অভিনয় করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি, নরেশচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী দেবী, কঙ্কাবতী প্রমুখ। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন কঙ্কাবতী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ এর ২১ জুন, ফলে তাঁর 'মুরা' চরিত্রের বাকি অংশ অভিনয় করে সমাপ্ত করেছিলেন রাজলক্ষ্মী দেবী। ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। 'চাণক্য' প্রথম মুক্তিলাভ করে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে।

জনক-নন্দিনী : বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নাটকটি চলচ্চিত্রে পরিচালনা করেন ফণী বর্মা, প্রযোজনা করে রাধা ফিল্মস্।

অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, জহর গাঙ্গুলি, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ।

রিক্তা : নাট্যকার তুলসী লাহিড়ির লেখা 'মায়ের দাবী' নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তর কালে নাম হয় 'রিক্তা'। ছবিটি তেমন ভাল হয়নি, বরং নানা কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ছবিটির নির্মাণ নিয়ে। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, তুলসী লাহিড়ি, ছায়া দেবী প্রমুখরা। পরিচালনা করেছিলেন সুশীল মজুমদার, প্রযোজনা

করেছিল ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড।

১৯৪০

স্বামী-স্ত্রী : নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটক হিসাবে নাট্যমঞ্চের উপযোগী করে লেখা। এই নাটকটির চিত্ররূপ দিলেন সতু সেন কমলা টকিজ লিমিটেড-এর প্রযোজনায়।
অভিনয়ে ছিলেন ছায়া দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ।
ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ২১শে মার্চ, ১৯৪৩-এ উত্তরা চিত্রগৃহে।

তটিনীর বিচার : এই নাটকটিও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা একটি মঞ্চসফল প্রযোজনা। পরিচালক সুশীল মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রযোজনায় নাটকটিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করে। এটি মঞ্চে যেমন সার্থক ও জনপ্রিয় হয়েছিল চলচ্চিত্রেও তা সাফল্য পেয়েছিল।
অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ।
ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। মুক্তিলাভ করে ৪ মে, ১৯৪০ রূপবাণী চিত্রগৃহে।

১৯৪১

রাজনর্তকী : ওয়াদিয়া মুভিটোনের প্রযোজনায় মধু বোসের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি এই তিনটি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। এর মূল কাহিনী নাট্যকার মন্মথ রায়ের লেখা 'রাজনটী' নাটক থেকে নেওয়া।
নাটক হিসাবে যতটা না সফল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল চলচ্চিত্রটি। এই চলচ্চিত্র মধু বসুর পরিচালনা, সাধনা বসুর অভিনয় ও তিমির-বরণের সুরের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৪২

শোধবোধ : রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের চলচ্চিত্ররূপ আমরা পাই ১৯৪২-এ এসে। সৌমেন মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রযোজনা করেছিল নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড। ছবিটি দেখানো হয় ২৮ মার্চ, ১৯৪২ চিত্রা-তে।

১৯৪৩

সহধর্মিনী : নাট্যকার যোগেশ চৌধুরির লেখা নাটকগুলির মধ্যে যতটা না সাহিত্য-মান ছিল তার ছেয়ে বেশি ছিল প্রযোজনার উপকরণ। 'সীতা' প্রযোজনা হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কারণ সেখানে ছিল শিশির ভাদুড়ির মতো মঞ্চ পরিচালকের

চিন্তা ভাবনা। যদিও চলচ্চিত্র হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল একই পরিচালকের হাতেই। পরবর্তীকালে অবশ্য মোটামুটিভাবে মঞ্চে সফল এবং চলচ্চিত্র হিসাবেও সফল এমন নাটক 'পরিণীতা'। নাটকটি মিনার্ভা মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরপর রূপশ্রী লিমিটেডের প্রযোজনায়, নীরেন লাহিড়ির পরিচালনায় নাটকটি 'সহধর্মিনী' নামে চিত্রায়িত হয়।
চলচ্চিত্রটি সফল হয়েছিল এই অর্থে—'মঞ্চসফল 'পরিণীতা' নাটককে পরিচালক নীরেন লাহিড়ি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করতেপেরেছিলেন।'
(বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র : নিশীথ মুখোপাধ্যায়)

স্বামীর ঘর : নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' ইতিপূর্বে চিত্রায়িত হয়েছে শিশির কুমার ভাদুড়ির পরিচালনায়। এরপর ইউরেকা পিকচার্স-এর প্রযোজনায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'স্বামীর ঘর' নাটকটি চিত্রায়িত হয়। চলচ্চিত্র হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৪৪

শেষরক্ষা : রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের রবীন্দ্রনাথ কৃত নাট্যসংস্করণ 'শেষরক্ষা' পেশাদার মঞ্চে বহু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চলচ্চিত্র হিসাবেও নাটকটি জনপ্রিয়তা পেল চিত্রভারতীর প্রযোজনায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়।
এতে অভিনয় করেছিলেন পদ্মা দেবী, অমর মল্লিক, জীবেন বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, রেবা দেবী প্রমুখ। রূপবাণী চিত্রগৃহে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪-এ মুক্তিলাভ করেছিল।

মাটির ঘর : বিধায়ক ভট্টাচার্যের বহু নাটক পেশাদার মঞ্চে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে। চিত্রায়িত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি। হরি ভঞ্জের পরিচালনায় ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স প্রযোজনা করে 'মাটির ঘর'। অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তুলসী লাহিড়ি, সন্তোষ সিংহ, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী প্রমুখ।
চলচ্চিত্র হিসাবে 'মাটির ঘর' ছিল মঞ্চ নাট্যেরই চিত্ররূপ।

১৯৪৫

দুই পুরুষ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোট গল্পের পাশাপাশি কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। তারাশঙ্করের এমনই একটি নাটক 'দুই পুরুষ' নিউ থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় ১৯৪৫ সালে চিত্রায়িত হয়।
মঞ্চে সফল হলেও 'দুই পুরুষ' চলচ্চিত্র হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

এর পরেও বহু নাটক বহুবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তবে তা পরিমাণে যেমন বেশি নয় এবং পূর্বের মতো ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছরও নয়। যাই হোক সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৮ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে'। ১৯৫১-তে তুলসী লাহিড়ির 'দুখীর ইমান' ও বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। ১৯৫২-তে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আবু হোসেন' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। ১৯৫৩-তে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' (এ. জে. প্রোডাকশনের পুনর্নির্মাণ) সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', তুলসী লাহিড়ির 'পথিক' ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন'। ১৯৫৫-তে অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে'। ১৯৫৬-তে 'চিরকুমার সভা' ও 'শ্যামলী'। ১৯৬৪-তে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ' এবং ১৯৬৫-তে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি'। উল্লিখিত নাটকগুলি মঞ্চে যতটা জনপ্রিয় ছিল চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে তার সবকটাই জনপ্রিয়তা পায়নি। যে কটি পেয়েছে সেগুলির মধ্যে তখন চলচ্চিত্রের উপকরণগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। কেননা চলচ্চিত্র তখন আর মঞ্চের প্রত্যাশী নয়, বরং মঞ্চই তখন ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। □